

বাঙলা বানানে ডাইরাম

আবদুল হকিম

বাঙলা বানানে ভাইরাস
আবদুল হাকিম

প্রকাশকঃ হুমায়রা জামান
ট্যালাহাসি, ফ্লোরিডা
ইউ এস এ ৩২৩০৩

প্রচ্ছদঃ হুমায়রা জামান
গ্রন্থস্বত্বঃ মৌ ও আবির
মুদ্রনঃ সাগর জামান
প্রকাশকালঃ ফেব্রুয়ারি ১, ২০০৮

বইটিতে
ঈ উ ণ ং শ
এই পাঁচটি অক্ষর ব্যবহার করা হয়নি

স্মরণ

বাঙলা ভাষার প্রান
সালাম বরকত রফিক জব্বার
এবঙ
নাম না জানা আর এক গুচ্ছ
রক্তে ভেজা ফুল

লেখক পরিচিতি



সেসব কেটেছে পিতার কর্মস্থল দেশের বিভিন্ন জায়গায়।
স্কুল ও কলেজ জীবন জন্মস্থান মাগুরাতে। স্নাতকোত্তর
ঢাকায়। ছাত্রজীবনে প্রথমে ছবি আঁকা, পরে নাটক, আবৃত্তি
ও সাহিত্য চর্চা। ছবি আঁকা, নাটক ও আবৃত্তিতে পুরস্কার
লাভ। সেই সূত্রে চলচ্চিত্র। চলচ্চিত্রকার আলমগির কবির
পরিচালিত ঢাকা ফিল্ম ইনস্টিটিউট থেকে ১৯৭৪ সালে
ফিল্ম এয়াপ্রিসিয়েসন কোর্স সমাপ্ত করেন। তারপর
চলচ্চিত্রকার আলমগির কবিরের কয়েকটি ছবিতে সহকারি

হয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা।

প্রথম গ্রন্থ, ছোটদের জন্য লেখা **কেমন করে স্বাধীন হলাম** প্রকাশিত হয় ১৯৮৯ সালে।
এরপর প্রথম উপন্যাস **এখনো গর্ভে তোমার** প্রকাশিত হয় ২০০০ সালে। ২০০১
সালে প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় উপন্যাস **তখন**। তৃতীয় উপন্যাস **কেন** প্রকাশিত হয়
২০০২ সালে। কাব্য সংকলন **আকাশ রঙ স্বপ্ন** ইলেকট্রনিক সঙ্করনে প্রকাশিত হয়
২০০৭ সালে।

আবদুল হাকিম বর্তমানে আমেরিকা প্রবাসি।

লেখকের অন্যান্য বই

- ❖ কেমন করে স্বাধীন হলাম (ছোটদের জন্য)
- ❖ এখনো গর্ভে তোমার
- ❖ তখন
- ❖ কেন
- ❖ কাব্য সংকলন –আকাশ রঙ স্বপ্ন (ইলেকট্রনিক সঙ্করন)
- ❖ কাব্য সংকলন (নির্মিয়মান)

প্রকাশকের কথা

ভাব প্রকাশের অন্যতম একটি মাধ্যম হলো যোগাযোগ, যা হতে পারে লেখায় অথবা কথা বলায়। যোগাযোগের স্তরগুলো হলো,

- ১→ কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে চিন্তাকে কেন্দ্রভূত করে বিষয় নির্বাচন করা;
- ২→ নির্বাচিত বিষয়ের কোন অঙ্গসটুকু উপস্থাপন করা হবে তার যথার্থ চয়ন;
- ৩→ বিষয়টি কিভাবে উপস্থাপিত হবে তার ভাবনা;
- ৪→ উপস্থাপনাকে ছকে আবদ্ধ করা;
- ৫→ সরাসরি উপস্থাপনযোগ্য কিনা তার পর্যবেক্ষন ও সিদ্ধান্তগ্রহন
- ৬→ ভাষা প্রয়োগের মাধ্যমে অবসেষে বিষয়টির উপস্থাপন

সুতরাং ভাষা হচ্ছে একটি প্রযুক্তি যার প্রয়োগে মনের ভাব প্রকাশিত হচ্ছে এবং অপরের সাথে যোগাযোগ স্থাপিত হচ্ছে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে তাই ভাষারও পরিবর্তন সাধিত হতে পারে। তখন ভাষাটির প্রয়োগেও পরিবর্তন হতে পারে। কঠোর নিয়মে আবদ্ধ ভাষার নিয়মবিধি মুক্তি লাভ করে হয়ে উঠে আরো সহজ, আরো সরল এবং জটিলতামুক্ত। যদি এ সকল উৎকর্ষ সাধিত না হয় অথবা বাধাগ্রস্ত হয় তাহলে সৃষ্টি হয় প্রযুক্তির প্রয়োগগত স্থবিরতা যা পরবর্তিতে আনয়ন করে ভাষার বিলুপ্তি। এভাবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় ভাষাটি বিলুপ্ত হয়েছে বা অবলুপ্তির পথে দাঁড়িয়ে আছে অথবা সঙ্কীর্ণ পরিমন্ডলে টিকে আছে। জটিল নিয়মে আবদ্ধ নয় এমন ভাষাগুলো সঙ্কীর্ণতা অতিক্রম করে প্রবেশ করে এমন এক জগতে যেখানে অধিক সঙ্খ্যক মানুষ সেই ভাষাটিকেই যেন বেছে নেয় ভাব প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে। যে ভাষার প্রয়োগ যত সহজ, দুর্বোধ্যতা যত কম সে ভাষা ততই জনপ্রিয় এবং মানবসম্প্রদায় কর্তৃক গ্রহণযোগ্য।

তেমনি একটি ভাষা বাঙলা। যার প্রয়োগে সরলতা আনয়নের জন্য কিছু চিন্তা, যুক্তি, তত্ত্ব ও তথ্যের সমন্বয় ঘটেছে জনাব আবদুল হাকিম রচিত *বাঙলা বানানে ভাইরাস* গ্রন্থে। লেখক বিনয়ের সাথে দাবি করেছেন তিনি পন্ডিতজন নন এবং জ্ঞান তার ক্ষুদ্র পরিমন্ডলেই আবদ্ধ। কিন্তু তারপরও তার মনের কিছু পল্লব এবং তার উত্তর খোঁজার সময়ে এই সিদ্ধান্তে তিনি এসে পৌঁছেছেন যে বাঙলা ভাষাটিকে আরো সহজভাবে সর্বস্তরের মানুষের কাছে উপস্থাপিত করার একটি উপায় নিসচই আছে। লেখক তার গভীর অবলোকন এবং যুক্তিবোধের দ্বারা সেই উপায়ের সন্ধানও দিয়েছেন। যদিও বারবার তার বিনম্র দাবি তিনি পন্ডিতজন নন। তারপরও ভাষার মত প্রযুক্তিকে সহজ করে দেবার জন্য যে কৌসল তিনি আজ বলে দিয়েছেন তা বহু পন্ডিজনের দক্ষতাকে বহুমাত্রায় ছাড়িয়ে যায়। বিভিন্ন ভাষার সন্দ সন্ডারে গঠিত বাঙলা ভাষা প্রাচুর্যে পূর্ণ। বাঙলা ভাষায় বিদেশি শব্দের আগমন যেমন সিমাহিন, সন্দ গঠনে বানান প্রয়োগে জটিলতাও সিমাহিন। আবদুল হাকিম দেখিয়েছেন বাঙলা বানানের সহজতর গঠন যা কিনা পাঁচটি অক্ষর বর্জনের মাধ্যমেও সম্ভব। ফলে যে কোন স্তরের শিক্ষিত মানুষ সজজভাবে বানান সেখার সুযোগ লাভ করবে। যে কোন স্তরের শিক্ষিত বলতে বুঝাচ্ছি যারা কিনা উচ্চশিক্ষায় অঙ্গসগ্রহন করেননি তাদের কথা বা যারা কিনা সদ্য অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন হয়েছেন তাদের কথা। আর উচ্চশিক্ষায় অঙ্গসগ্রহনকারিগন তো সবসময়ই সে জ্ঞান আহরনের সুযোগে সৌভাগ্যবান। *সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়* তাঁর *ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ* গ্রন্থে বলেছেনঃ

“[২.১৪১] অনেক ভাষায় স্বর-বর্ণের হ্রস্ব ও দীর্ঘ উচ্চারণের উপরে অর্থের পার্থক্য নির্ভর করে; যেমন, ইংরেজীতে, kin [খিন]--হ্রস্ব ই--অর্থ ‘সম্পর্ক,’ keen [খী--ন] -- দীর্ঘ -ঈ.....অর্থ ‘তীক্ষ্ণ’ ;

সংস্কৃত 'दि--न (= दिवस), दी--न (= दरिद्र)'। বাঙ্গালা ভাষায় স্বর-বর্ণের হ্রস্ব বা দীর্ঘ উচ্চারণের উপরে শব্দের অর্থ নির্ভর করেনা।

[২.১৪৪] বাঙ্গালা উচ্চারণে হ্রস্ব-দীর্ঘের এই পার্থক্য রক্ষিত না হওয়ার কারণে, বাঙ্গালা বানানেও এ বিষয়ে বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই; যথা, 'একটি-একটী; হাতি-হাতী; ঘড়ি-ঘড়ী; চুন-চুন; সুতা-সূতা; দীঘি-দীঘী-দীঘী।' এজন্য প্রায়ই হ্রস্ব-ই ও দীর্ঘ-ঈ-র অদল-বদল দেখা যায়, বিশেষতঃ শব্দের শেষে।

[২.১৪২] বাঙ্গালা ছন্দে এই জন্য স্বর-ধ্বনির হ্রস্বতা বা দৈর্ঘ্য বাঁধা-ধরা নহে, একই স্বর-ধ্বনি অবস্থান-গতিকে হ্রস্ব বা দীর্ঘ দুই-ই হইয়া থাকে। সংস্কৃতে 'আ, ঈ, উ, ঋ, এ, ঐ, ও, ঔ' সর্বদা দীর্ঘ, কিন্তু বাঙ্গালায় এগুলি হ্রস্বও হয়, দীর্ঘও হয়;..."

তাই আবদুল হাকিমের পরামর্স যদি হয় দীর্ঘ-ঈ এবং দীর্ঘ-উ বাদ দিয়ে জটিলতামুক্ত হওয়া, তা সানন্দে গ্রহণযোগ্য হতে পারে।

ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে.

"[২.১৭] মূর্ধন্য 'ণ' - এর ধ্বনি এখন বাঙ্গালায় লুপ্ত-সংস্কৃত শব্দে, এবং কুচিৎ প্রাকৃত-জ ও বিদেশী শব্দে'ণ' লিখিত হইলেও, বাঙ্গালায় ইহার উচ্চারণ দন্ত্য 'ন'- এরে উচ্চারণ হইতে অভিন্ন; যথা -'রণ, চরণ, পুরাণ, করুণা; কাণ, পাণ, বাণান, সোণা (= কান, পান, বানান, সোনা).....ইত্যাদি।

শ, ষ, স-এই তিনটি ধ্বনির উচ্চারণ এখন বাঙ্গালায় এক-ইংরেজীর sh এর মত।

বাঙ্গালায় 'ং' ও 'ঙ' উচ্চারণে অভিন্ন হইয়া যাওয়ায়, একের বদলে অন্যের ব্যবহার খুবই সাধারণ; যথা--বাংলা-বাঙলা; রং, রঙ--রঙের; ভাং-ভাঙড়' ইত্যাদি।

[২.৭২১] [১ক] খাঁটি বাঙ্গালা অর্থাৎ প্রাকৃত-জ শব্দের বানানে মূর্ধন্য 'ণ' -এর ব্যবহার কুচিৎ দেখা যায়-কিন্তু মূর্ধন্য 'ণ' এর বিশিষ্ট উচ্চারণ বাঙ্গালায় এখন অজ্ঞাত; এই সকল প্রাকৃত-জ শব্দে দন্ত্য 'ন' লিখিলেও কোনও ক্ষতি নাই-দন্ত্য 'ন' লেখাই বরং ভাল;। কতকগুলি শব্দে" মূর্ধন্য 'ণ' ও দন্ত্য 'ন' দুই-ই ব্যবহৃত হয়; যথা - 'রাণী-রানী;...কাণ-কান ... ইত্যাদি। বিদেশী শব্দেও কখনও কখনও সংস্কৃত শব্দের বানানের অনুকরণে 'ণ' লেখা হয় (সাধারণতঃ শব্দের শেষে), কিন্তু এ ক্ষেত্রেও দন্ত্য 'ন' লেখাই সমীচীন; যথা-'কোরাণ ('পুরাণ' শব্দের দেখাদেখি)-কোরান...; ইরাণ, তুরাণ-ঈরান, তুরান;ইত্যাদি।"

ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর গ্রন্থে তাঁর বক্তব্য যেভাবে ব্যক্ত করেছেন, এই গ্রন্থে জনাব আবদুল হাকিম আরেক ধাপ এগিয়ে এইটুকুই বলতে চেয়েছেন যে, ণ, শ, ং বাদ দিলেও সন্দ্র শ্রবনে এবং বোধগম্যে হেরফের তো হবেই না, বানান আরো জটিলতামুক্ত হবে। আর এই চিন্তার ফলস্রুতিতেই আজ প্রকাশিত হল বাঙলা বানানে ভাইরাস গ্রন্থটি। এতে লেখকের দুটি প্রবন্ধ সন্নিবেসিত আছে। একটি **বাঙলা বানানে ভাইরাস** অপরটি **তোমার আমার বাঙলা বানান**। প্রবন্ধ দুটি নিঃসন্দেহে লেখকের গভির অন্তর্দৃষ্টি ও সুক্ষ চিন্তার স্বাক্ষর বহন করে। লেখকের অন্যান্য প্রকাশিত গ্রন্থ ও কাব্য সঙ্কলনের মত এ প্রবন্ধ দুটিতেও ঈ,উ,ণ,ং,শ এই পাঁচটি অক্ষর ব্যবহার করা

হয়নি। গবেষনালব্ধ এই লেখা দুটি লেখকের অক্লান্ত পরিশ্রমও লব্ধ। প্রবন্ধ দুটি পাঠ ও উপলব্ধি করে যদি কার্যক্ষেত্রে এর প্রয়োগ ঘটাতে পারি তাহলে আমরাও এর সফলতার অঙ্গসিদার হতে পারব।

সুক্ষ্ম অবলোকন সহজবোধ্য নাও হতে পারে। এর গ্রহণযোগ্যতা সময়সাপেক্ষ ও কষ্টকর হতে পারে। তারপরও বানানের সহজতর নিয়ম প্রয়োগে ভাষার সাথে একাত্ম হবার আবারণিত দ্বার সবসময়ই উন্মুক্ত থাকবে। যদি বন্ধ ঘরে আবদ্ধ থাকতে আর ইচ্ছে না করে, পাঠক সমাজ নিসচই খুঁজে নেবে তার আবারণিত উন্মুক্ত দুয়ার।

হুমায়রা জামান

ফ্লোরিডা

ইউ এস এ

জানুয়ারি ১৭, ২০০৮

একান্ত

প্রথম যেদিন লিখতে বসলাম, সেদিনই বাঙলা বানান নিয়ে হোচট খেললাম। বানান নিয়ে অস্থিরতা আমার আর কাটলো না। অনেক ভেবে চিন্তে আমার কাছে মনে হল, বাঙলা ভাষা ঙ ঊ ণ শ ং এই পাচটি অক্ষর ছাড়াও চলতে পারে। আমার প্রথম লেখা ছোটদের জন্য *কেমন করে স্বাধীন হলাম* ছাড়া পরের লেখাগুলোতে আমি ওই পাচটি অক্ষর আর ব্যবহার করিনি। বাঙলায় কেন ওই পাচটি অক্ষর লাগেনা তা বোঝাবার চেষ্টা করতে গিয়ে আমি দুটি প্রবন্ধ *বাঙলা বানানে তাইরাস* ও *তোমার আমার বাঙলা বানান* লিখে ফেললাম। কিন্তু লেখা দুটো প্রকাশ আর করা হলনা। ভাগ্য ফেরাতে আটলান্টিক পাড়ি দিলাম। ভয় ছিল লেখা দুটো হয়তো হারিয়ে যাবে। তাই এখানে আসার আগে আমার প্রকাশিত অন্যান্য বইয়ের সাথে পাণ্ডুলিপি দুটোর কপি ঢাকা জাতীয় গ্রন্থাগার ও আর্কাইভস এবং বাঙলা একাডেমি গ্রন্থাগারে জমা দিয়ে এসেছিলাম।

অসাধারণ এক ব্যক্তিত্ব কবি হুমায়রা জামান। অর কাছ থেকে তাগিদের পর তাগিদ আসতেই লাগলো। শেষে চার বছরের ধুলো ঝেড়ে, কিছু কাটাকাটি করে পাণ্ডুলিপিটা ওর হাতে তুলে দিলাম। নিজের কাজ ফেলে, অনেক পরিশ্রম আর যত্নে ও লেখাদুটো ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে প্রকাশ করল। কবি হুমায়রা জামানের তুলনা নেই। ওর কাছে আমি ঋণী হয়ে রইলাম। সাথে সাথে ডঃ চঞ্চল জামানের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ ওর সহযোগিতার জন্য।

ঢাকা জাতীয় গ্রন্থাগার ও আর্কাইভসের সহকারি পরিচালক মির সাহাবুদ্দিন এবং বাঙলা একাডেমির উপ-পরিচালক (গ্রন্থাগার) সাহিদা খাতুন ওই সময় আমাকে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছিলেন। ওদের কথা ভুলব না।

পাঠকদের মতামতের জন্য আমার চোখ কান খোলা রইল।

আবদুল হাকিম

৩৯২৫/বি, ক্লার্কস লেন

বাল্টিমোর, এম ডি ২১২১৫

ইউ এস এ

টেলিফোন ৪১০-৩১৮-৮১২৫

তারিখ ০১.০১.২০০৮

বাঙলা বানানে ভাইরাস

বড় সাহেব ক্রুদ্ধ মেজাজে হুঙ্কার দিয়ে বললেন , ডাকো ওই কেরানি বেটাকে।

কেরানি বেচারি হস্তদণ্ড হয়ে ছুটে এসে বড় সাহেবের সামনে দাঁড়িয়ে হাত কচলাতে লাগলো।

চোখদুটো রাঙিয়ে বড় সাহেব এবার কেরানি বেটার দিকে তাকিয়ে বললেন, লেখাপড়া কি ঘাস খেয়ে সিখেছেন?

স্যার---

কি স্যার স্যার করছেন অ্যা। এটা কি লিখেছেন? বগুড়া। ইংরেজিতে বগুড়া কি ভাবে লেখে অ্যা? দেখেন। ভাল করে দেখে তারপরে সেখেন। যান।

ফাইলটা বড় সাহেব কেরানি সাহেবের দিকে ছুড়ে দিলেন।

কেরানি সাহেব এবার তাকিয়ে দেখলেন তার লেখা BOGURA বানানটি লাল কালি দিয়ে কেটে বড় সাহেব সুন্দর করে লিখে দিয়েছেন BOGRA । কিছুক্ষন হা করে দাড়িয়ে দাড়িয়ে ভাবতে ভাবতে মনে পড়ল, তাইতো, বস ইজ অলওয়েজ কারেন্ট। একটা সালাম দিয়ে রুম থেকে বেরিয়ে এলেন কেরানি সাহেব।

এক সময়ে আমরা ইঙলিসে ঢাকা বানান লিখতাম DACCA। আর এখন লিখি DHAKA । উচ্চারণে আমরা বলতাম ঢাকা। লিখতে গিয়ে লিখতাম ড্যাকা। ব্যাপারটা হাস্যকর বলেই মনে হয়। তবে আনন্দের কথা, আমাদের বোধদয় হয়েছে। আমরা আমাদের রাজধানির ইঙলিস বানান ঠিক করে নিয়েছি। তবে এ কাজটির জন্য কিন্তু বাহবা পেয়েছেন বাংলাদেশের তত্‌কালিন প্রেসিডেন্ট হোসেইন মোহাম্মদ এরসাদ। পরামর্সটি যিনিই দিয়ে থাকেননা কেন, কৃতিত্বটা কিন্তু এরসাদ সাহেবেরই। তিনি আদেশ দিলেন, ব্যাস হয়ে গেল। কেউ টু সন্দটি করলো না। বুদ্ধিজিবি পরিপূর্ণ আমাদের এই বাংলাদেশ। তারা কিন্তু এ কাজটি অনেক আগেই করতে পারতেন।

ঢাকা বানান না হয় সুন্দর হল। কিন্তু বগুড়া , সিলেট, ময়মনসিংহ, যসোর, চট্টগ্রাম এদের কি হবে? ইঙলিসে এ বানানগুলো সঠিক করে লেখার জন্য কি আর একজন খাকি পোষাকধারি সরকার প্রধান বা রাষ্ট্রপতির অপেক্ষায় থাকতে হবে আমাদের। কেরানি সাহেবরা আর কতকাল বড় সাহেবদের চোখ রাঙানি দেখবেন? সেই কবে ফিরিঙ্গি প্রভুরা আমাদের দেশ সাসন করতে এসে তাদের সুবিধার জন্য আমাদের বিভিন্ন জায়গার নামগুলো বিকৃত করে গেছেন। আমরা প্রভুদের সেই কৃপা আজও ভুলতে পারিনি। ভাগিগ্যস MAGURA বানানটির প্রতি প্রভুদের দৃষ্টি পড়েনি, নয়তো ওটা হয়ে যেত MAGRA । এমনকি বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রান, রবিন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামও তারা বিকৃত করে গেছেন। তারা লেখেন RABINDRANATH TAGORE । উচ্চারণের সুবিধার জন্য তারা হয়তো THAKUR কে TAGORE বলেন। কিন্তু তাই বলে আমরা কি ভাবে ঠাকুরকে ট্যাগোর বলি বা লিখি । ইংরেজিতে আমাদের THAKUR লিখতে বা বলতে তো কোন অসুবিধা নেই।

ইঙলিস বানানের বেলায় না হয় ফিরিঙ্গি প্রভুদের কথা বলে পার পেয়ে গেলাম। কিন্তু বাঙলা। বাঙলা বানানের বেলায় কি হবে? বাঙলা বানান ভুল হবার কারনে অবস্য কেরানি সাহেবকে বড় সাহেবের চোখ রাঙানি দেখতে হবে না, কারন বড় সাহেব নিজেও বাঙলা বানান লিখতে গিয়ে মাঝে মাঝে বিব্রত হয়ে পড়েন। তাতে কোন অসুবিধে নেই, কারন এই বিব্রত বোধ বড় সাহেবের জন্য বাঙলা চর্চা না থাকার এক অহঙ্কার।

বাঙালি, বাঙালী, বাংলালি, বাংলালী, বাঙ্গালি, বাঙ্গালী। এর কোনটি সুন্দর বানান? আমরা জাতিতে সমৃদ্ধ, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। একটি সমৃদ্ধ জাতির পরিচয় লিখতে গিয়ে প্রথমেই হোচট খেতে হয় তার বানান নিয়ে। একটি জাতির নামের বানান কি ভাবে ছয় রকম হতে পারে? এবং ছয়টি বানানই কিভাবে সুন্দর হতে পারে? এ এক গোলক ধাধা। এর যে কোন একটিকে যদি সুন্দর ধরে নিই, তবে বাদ বাকি পাঁচটি অসুন্দর। কিন্তু প্রয়োগের ক্ষেত্রে তা হচ্ছে না। সবগুলো বানানই প্রয়োগ হতে দেখা যায়। আবার বাংলা, বাঙলা, বাঙ্গলা, বাঙ্গালা। আমাদের প্রাণপ্রিয় মাতৃভাষা। সালাম বরকত রফিক জব্বারের বাঙলা ভাষা। যে ভাষা আজ পুরো বিশ্ব জুড়ে সমাদৃত। এখানেও পাওয়া যাচ্ছে চার রকম। এ ক্ষেত্রেও একই কথা।

এখানে একটি উদাহরণ দেই। *তবু বাংলা কাগচে ইংরেজির অনুকরণ করে সেগুলি ছাপে। যেমন ধরুন, অমুক জাহাজ অমুক স্থল থেকে এসেছে। অমুক জাহাজ অমুক দিনেতে কলকাতা ছেড়ে ইংলন্ডে যাবে। এই সংবাদ পাঠে বাঙালীর কি উপকার? আমাদের আচার-ব্যবহার সমুদয়ই ইংরেজ জাতি হতে ভিন্ন। সুতরাং বাঙলা কাগচে বাঙ্গালার নিজস্ব খবর,-----।* আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের অন্যতম দিকপাল সুনিল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস *সেই সময়*, পৃষ্ঠা -৫৮২। এটা একটা সঙলাপ। যিনি এই সঙলাপ উচ্চারণ করেছেন, তার উচ্চারণ নিস্চই সব সময় একই রকম হবার কথা। অথচ একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাব সঙলাপটিতে বাঙলা বানান তিন রকম লেখা হয়েছে। যেহেতু তিন রকম বানানই আমরা ব্যবহার করে আসছি, তাই এমনটি হওয়া বিচিত্র নয়। এখানে আরও কিছু উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। বাঙলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত মনসুর মুসা রচিত দুটি বই, *প্রাথমিক বাঙলা সাংগঠনিক পাঠ* ও *বাঙলা পরিভাষা ইতিহাস ও সমস্যা*। এখানে বই দুটির নাম করনে *বাঙলা* লিখতে গিয়ে ঙ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু বাঙলা একাডেমি'র বাঙলা লিখতে গিয়ে ং ব্যবহার করেছেন। লেখকের আর একটি বই, *ভাষা পরিকল্পনা ও অন্যান্য প্রবন্ধ*। বইটির চমতকার প্রচ্ছদের একটি লাইন এভাবে লেখা হয়েছে, *বাঙলা দেশের ভাষা বাঙলা*। আবার, বদরদ্দিন উমর রচিত *সংস্কৃতির সংকট* বইটির পাতায় আমরা বাঙলাদেশ কথটির বানান দু'রকম দেখতে পাই। যেমন, *বাঙলাদেশ* এবং *বাংলাদেশ*। সুনিল গঙ্গোপাধ্যায় তার *পূর্ব-পশ্চিম* উপন্যাসটিতে বাঙলাদেশ লিখতে গিয়ে এক জায়গায় ং, অন্য জায়গায় ঙ ব্যবহার করেছেন। পৃষ্ঠা ৩৩৪ ও ৪৩০। এক্ষেত্রে সহিদ জননি জাহানারা ইমাম তার *একাত্তরের দিনগুলি* বইটিতে বাঙলাদেশ বানান লিখতে গিয়ে সবসময় ঙ ব্যবহার করেছেন। তিনি লিখেছেন *বাঙলাদেশ*। এখন *বাঙলা* শব্দটির দুই ধরনের বানান প্রসঙ্গে যদি কেউ প্রশ্ন তোলেন, তাকে কি দোষ দেয়া যাবে?

বানানের এই বিভ্রাট পুষে না রেখে এর সহজ কোন সমাধান খুঁজে পাওয়া যায় কিনা তা একটু ভেবে দেখলে বোধ হয় বড় কোন ক্ষতি হবার সম্ভবনা নেই। একদম সহজ ভাবে দেখতে গেলে হয়তো একটা সমাধানে পৌঁছানো সম্ভব। আর যদি ব্যাকরণ বা ধ্বনিতত্ত্বের কঠিন পাণ্ডিত্যপূর্ণ হিসেব নিকেসের নিঞ্জিতে পরিমাপ করতে যাই তাহলে আর হল না। সমস্যা যেখানে ছিল সেখানেই থেকে যাবে। পরিবর্তন বা সঙ্কসার কোনদিনই প্রচলিত নিয়ম কানুন বা নীতিকথা মেনে হয় না। এর জন্য চাই বিপ্লব। বাঙলা ভাষার সঙ্কসারের ক্ষেত্রেও চাই বিপ্লব। আর এই বিপ্লব ঘটতে হলে সুধু ইচ্ছেসক্তিই যথেষ্ট।

বাঙলা ভাষা বা সাহিত্যের অতিতের দিকে তাকালে দেখা যায়, এমন এক সময় ছিল যখন গদ্য সাহিত্যের কথা কেউ ভাবতেও পারতনা। সাহিত্য বলতে ছিল সুধু পদ্য। কিন্তু সময় বসে থাকল না। তার নিজস্ব তাগিদে গদ্যকে ঠিকই টেনে আনল। গদ্য সাহিত্যে সাধু ভাষাতো বটেই, তার পরেও কঠিন দাতভাঙ্গা বাঙলা লেখার প্রতিযোগিতা চলতে থাকলো বহু যুগ ধরে। অবসেষে এলেন প্যারিচাঁদ মিত্র (টেকচাঁদ ঠাকুর) তার *আলালের ঘরে দুলাল* নিয়ে। প্রথমবারের মত তিনি ব্যবহার করলেন কথ্য ভাষা তার উপন্যাসে। ব্যাস, আর যায় কোথায়। হায় হায়, গেল গেল। সাধারণ মানুষের মুখের ভাষায় সাহিত্য রচনা! কথ্য ভাষায় উপন্যাস! কি সর্বনাস। সাহিত্যের মান একেবারেই ধুলোয় মিসিয়ে দিল ব্যাটা। ব্যাটাকে ধর। একঘরে কর। কিছুদিন চললো বাক বিতন্ডা। কাদা ছোড়াছুড়ি। সময়ের সাথে সাথে যাদের বোঝার তারা ঠিকই বুঝলেন। আর গাঁড়াপছিরী আঁকড়ে ধরে রাখলেন তাদের গাঁড়ামিকে। স্বয়ং রবিন্দ্রনাথও বুঝেছিলেন ব্যাপারটা। তাইতো তার সাহিত্য সমুদ্রে সাধু ও চলিত দু'রকম ভাষার প্রয়োগই দেখা যায়। প্রথম দিককার লেখায় সাধু এবং পরে এসে চলিত। তিনি

নিঃসন্দেহে দারুন বুদ্ধিমান ছিলেন, তাইতো সময়ের দাবিকে অগ্রাহ্য করেননি। পাসাপাসি সে সময়ের অনেক বাঘা বাঘা কবি সাহিত্যিক আর পন্ডিতরা প্যারিচাঁদ মিত্রের মত গ্রহন তো করেনইনি, বরঙ তাকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু ইতিহাস তাদের পক্ষে কথা বলে না। এরপর থেকে সুরু হল চলিত ভাষা। সাধু'র পাসাপাসি চলিত। সময় যত গড়িয়ে যায় ততই চলিত ভাষার পাল্লা ভারি হয়ে আসে। তারপর এক সময় হারিয়ে যায় সাধু ভাষা। মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তকেও একই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তাঁর নাটক বা অমিত্রাক্ষর ছন্দ দেখে ততকালীন গোঁড়াপন্থিরা বিলেতি স্টাইলের ধুষ্টো তুলে নাক সিটকেছিলেন। কিন্তু ইতিহাস বলে, মাইকেলের নাটক বা অমিত্রাক্ষর ছন্দ, বাঙলা ভাষা, সাহিত্য বা সঙ্কৃতিতে এক নতুন যুগের সৃষ্টি করেছিল। যুগে যুগে এভাবেই ভাষার আধুনিকায়ন হয়ে থাকে। যুগের দাবি মেনে নেয়াইতো বুদ্ধমানের কাজ। সুধু তাই নয়, দাড়ি কমা সেমিকোলন, এই যতি চিহ্নগুলোও কিন্তু গোড়ার দিকে ছিল না। সময়ের প্রয়োজনেই এগুলো এসেছে। উদাহরণ, ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচিত *বেতাল পঞ্চ বিংশতি*। অথবা আরবি ভাষার প্রথম দিককার কোন রচনার দিকে চোখ ফেরালেও দেখতে পাব, তখন জের জবর পেস ইত্যাদির কোন ব্যবহার ছিল না। সময়ের প্রয়োজনেই এগুলো এসেছে।

তবে হ্যা, বাঙলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করার জন্য সেকালের পন্ডিতরা বহু বিদেশি সন্দ, বিশেষ করে সঙ্কৃত সন্দ বা অক্ষরকে বাঙলা ভাষায় ঢুকিয়েছেন। এবঙ বাঙলা ভাষায় ওই সব সন্দ বা অক্ষর ব্যবহারের একটা নিতিমালা দিয়ে গেছেন। কিন্তু সময় অনেক গড়িয়েছে। এখন আর ওই সন্দ বা অক্ষরগুলো বিদেশি অথবা সঙ্কৃত সন্দ বা অক্ষরের পরিচয়ে বসে নেই। ওগুলো এখন বাঙলার নিজস্ব সম্পদ। এখানে বদরুদ্দিন উমর রচিত *সংস্কৃতির সংকট* বইটির ৬৭ পৃষ্ঠা থেকে দু'টি লাইন আমরা দেখতে পারি। তিনি লিখেছেন, *প্রায় আড়াই হাজার আরবী ফারসী তুর্কী শব্দ কয়েক শতকের বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে বাংলা ভাষায় সহজ ভাবেই প্রচলিত হয়ে এসেছে এবং সেগুলি বাংলার নিজস্ব সম্পদেই পরিণত হয়েছে।* বাঙলা ভাষা লেখা- পড়ার ভাষা হিসেবে সমৃদ্ধ হয়েছে অনেক পরে একথা সত্যি, কিন্তু মানুষের মুখের ভাষা হিসেবে এ ভাষা বেস পুরনো। পক্ষান্তরে সঙ্কৃত ভাষা সুধু পন্ডিত জনের পাণ্ডিত্য চর্চারই ভাষা। এ ভাষা কোনদিন কোন মানুষের মুখের ভাষা ছিলওনা, ভবিষ্যতেও কোন মানুষের মুখের ভাষা হবেও না। আর তাই সঙ্কৃত অত্যন্ত উচ্চমানের ভাষা হওয়া সত্ত্বেও বর্তমানে তার প্রয়োজন হারিয়েছে। যে ভাষার নিজেই কোন অস্তিত্ব নেই, সেই ভাষার পরিচয়ে আজও বাঙলা ভাষায় কিছু সন্দ বা অক্ষর চিহ্নিত হবার কোন প্রয়োজন নেই। এতে সুধু জটিলতাই বাড়বে।

অক্ষর যেহেতু ভাষার অন্যতম প্রধান উপাদান, তাই ভাষা আধুনিকায়নের ধাক্কা অক্ষরকেও সহিতে হবে বৈকি। বাঙলা বা বাঙালি কে আমরা উচ্চারণ করতে গিয়ে খুব কম ক্ষেত্রেই বাঙ্গলা বা বাঙ্গালি উচ্চারণ করে থাকি। বাঙ্গলা বা বাঙ্গালি বলতে বা লিখতে গিয়ে ঙ এবং গ যুক্ত ভাবে এসে যাচ্ছে। যেখানে বাঙলা বা বাঙালি উচ্চারণে আমরা অভ্যস্ত এবং এই বানান টাকে মেনে নিয়েছি, তবে কেন আর মাঝখানে গ কে নিয়ে টানাটানি। এছাড়া বাঙলা বা বাঙালি লিখতে গিয়ে আরো দুটি অক্ষর নিয়ে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। এগুলো হচ্ছে ং এবং ঙ্গ। ং এর বদলে যদি ঙ এবং ঙ্গ এর বদলে যদি ই ব্যবহার করে কাজ চালানো যায় তবে ক্ষতি কি। এখানে একটা উদাহরণ দেই, *হ্যাঁ বলছি। যদি সাহস থাকে, যা করতে বলছি কর। সঙের মত দাঁড়িয়ে থাকবি না। সং দেখতে আর ভাল লাগে না।* নন্দিত কথা সাহিত্যিক হুমায়ুন আহমেদের *অপেক্ষা* উপন্যাসের একটি সঙলাপ। পৃষ্ঠা-১৪৪। এখানে তিনি সং লিখতে গিয়ে ং ব্যবহার করেছেন। কিন্তু যখনই সন্দটির সাথে এ-কার ব্যবহার করতে হয়েছে তখনই ং এর বদলে ডাক পড়েছে ঙ এর। নাসরিন জাহান তার *উড়ুকু* উপন্যাসটিতেও একই কাজ করেছেন। পৃষ্ঠা-১৮৭ ও ১৮৮। কেন? এই কেন'র উত্তর নিস্চই পন্ডিত জনেরা দিতে পারবেন, কিন্তু আমাদের মত সাধারণ বাঙালিদের প্রশ্ন থেকেই যাবে। তবে আমরা সুধু এটুকু বলতে পারি যে, ঙ দিয়ে সঙ এবং সঙের দুটো সন্দই লেখা যায়, কিন্তু ং দিয়ে সং লেখা যাচ্ছে কিন্তু সঙের লেখা যাচ্ছেনা। এমনি ভাবে বাঙলা ভাষায় ং যত জায়গায় ব্যবহার করা হয়ে থাকে তার সব জায়গাতেই ঙ ব্যবহার করা সম্ভব। কিন্তু যত জায়গায় ঙ ব্যবহৃত হয়ে থাকে তার প্রত্যেক জায়গায় ং ব্যবহার করা সম্ভব নয়। ং এর বদলে ঙ যে ইচ্ছে করলে অনেক জায়গাতেই ব্যবহার করা যায় রবিন্দ্রনাথের *শেষের কবিতা* তার একটি বড় উদাহরণ। তিনি কিন্তু অনেক আগেই রঙ এবং রঙের এ দুটো সন্দেই ঙ ব্যবহার করে

একাত্তরের এক শহিদ মেয়েকে নিয়ে লেখা.....। পৃষ্ঠা-৫৬৭। মনুমেন্ট হয়ে গেছে শহিদ মিনার। পৃষ্ঠা-৫৮৪। সুনিল গঙ্গোপাধ্যায় সহিদ লিখতে ই-কার ব্যবহার করেছেন। আমরা তার এই বানান নিয়ে কোন আলোচনা বা হৈ চৈ করছি না। কারন অর্থ বুঝতে আমাদের কারো কোন অসুবিধা হয়নি। অর্থাৎ ওই বানান আমরা মেনে নিয়েছি। অভিধানেও ই-কার ও ঙ্গ-কার, দুই ভাবেই লেখা হয়েছে। একই সন্ধে দু'রকম বানান জটিলতাই সৃষ্টি করে। তাই ঙ্গ-কার বেড়ে ফেলে , ই-কার রাখাই উচিত হবে। তাহলে ঙ্গ-কারের আর প্রয়োজন কি? তেমনিভাবে একাডেমি বানান লিখতে গিয়েও যে ঙ্গ-কারের বদলে ই-কার এসে যাবে এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। ইতোমধ্যে যা শুরু হয়ে গেছে। যেমন-ডঃ হুমায়ুন আজাদ তার **আমরা কি এই বাংলাদেশ চেয়েছিলাম** বইটির ১০১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন,বাঙলা একাডেমির মহাপরিচালককে। এছাড়া আধুনিক পত্র পত্রিকার পাতায় লক্ষ্য করলে একাডেমি বানানে ই-কারই দেখা যায়। কারন বাঙলা ভাষায় মনে হয় ঙ্গ-কারের আর কোন দরকার নেই। তবে আমাদের একটু বেশিই সময় লাগে। সেই কবে রবি ঠাকুর গাড়ি বাড়ি পাখি বানানে ই-কার লাগিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু আজও আমরা এই বানানগুলো লিখতে গিয়ে ই-কার না ঙ্গ-কার হবে তা নিয়ে তালগোল পাকিয়ে ফেলি। যেমন কবি সমুদ্র গুপ্তের **সাত সমুদ্র** কাব্য গ্রন্থের একটি কবিতায় তিনি লিখেছেন ,তুমি আমার বাড়ীতে এসো। পৃষ্ঠা-৪২। অন্য একটি কবিতায় তিনি লিখেছেন,বিশাল বাড়ি কপট বিহীন.....। পৃষ্ঠা -৪৫। এখানে তিনি বাড়ি লিখতে একবার ই-কার, আর একবার ঙ্গ-কার ব্যবহার করেছেন। যতদিন পর্যন্ত ঙ্গ-কার থাকবে ততদিন এই তালগোল পাকানো থেকে আমাদের রেহাই নেই।

উ এর ক্ষেত্রেও একই কথা বলতে হয়। উর্মি বা উষা লেখার জন্য একটা অক্ষর ধরে রাখা, একটা বোঝা ছাড়া আর কিছু না। উ দিয়ে উর্মি বা উষা লিখলে মনে হয় কেউ অর্থ হিসেবে সান্ত জলধারা বা সন্ধ্যা বুঝে নেবেন না। বাক্যের ভিতর সন্দ দুটি থাকলে তো না বোঝার কোন প্রশ্নই আসেনা। সুনতে আর বলতে যদি কোন অসুবিধা না হয় তবে লিখতে বা পড়তে অসুবিধাটা কোথায়? তাহলে এ কথা বলা যায় যে, ইচ্ছে করলে বাঙলা বর্নমালার কলেবর হ্রাস করতে উকেও সরিয়া রাখা যায়।

এবার ণ। আমার মনে হয় ণ কে বাদ দেয়া সবচেয়ে সহজ। উচ্চারণের ক্ষেত্রে ণ আর ন এর পার্থক্য বুঝতে হলে মুখের সামনে পাতলা কাগজ রেখে উচ্চারণের প্রাকটিকাল ক্লাস করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। অতএব, ণ এর স্থলে ন দিয়ে কোন সন্দ যদি বলি তাতে অর্থ বোঝা যাবে না, একথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। অতএব, লেখা বা পড়ার ক্ষেত্রেও ণ কে বাদ দেয়া সম্ভব। এতে কোমলমতি ছেলেমেয়েরা স্যারের ধমক খাওয়া থেকে অনেকাংশে বেচে যাবে।

বলা হয়ে থাকে স এর উচ্চারণ ছ এর মত। স এর উচ্চারণ যদি ছ এর মত হয় তবে ছ এর উচ্চারণ কিসের মত হবে? নাই এর মত? এবার আমরা কয়েকটি সন্ধের দিকে একটু লক্ষ্য করি। আশ্রয়, সাশ্রয়, প্রশ্রয় শ্রুতি, শ্রেষ্ঠ, শ্রেয়, শবন, শাবন, শৃগাল, শ্রী, শ্রাবন্তি, শ্রাবন্তি, শ্রান্তি, শ্রম, শ্রদ্ধা, শ্রাদ্ধ, শ্রমিক, শ্রোতা। এমনি সন্দ আরো আছে। এ সন্দগুলো শ দিয়ে লেখা হয়েছে। কিন্তু উচ্চারণ হচ্ছে ছ এর মত। তাহলে স এর উচ্চারণ ছ এর মত হয়, এ কথাটি ধোপে টিকছে না। ধ্বনিতত্ত্বের হিসেবে এই সন্দগুলোর শ এর উচ্চারণের সাথে ছ এর উচ্চারণে সামান্য পার্থক্য হয়তো খুজে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু এই সামান্য পার্থক্যের জন্য খুব কাছের ছ কে দূরে ঠেলে দিয়ে উচ্চারণের ক্ষেত্রে অনেক দূরের শ কে নিয়ে এসে জুড়ে দেবার প্রয়োজন কি? ছ উচ্চারণ করতে গিয়ে যদি শ ব্যবহার করতে হয়, তবে ছ রয়েছে কি সুন্দর একটা দেহবল্লরি নিয়ে নাচের মুদ্রায় দাঁড়িয়ে থাকবার জন্য? এতে কি ছ কে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে না? আর যদি ওই সন্দগুলো লিখতে স একটা না লাগালে মহাভারত অসুন্দর হয়েই যায়, তবে স লাগালেইতো হয়। শ্রোত বানান যখন আমরা স দিয়ে লিখতে পারছি, তখন শ্রোতা বানানটাও না হয় স দিয়ে একবার চেষ্টা করে দেখি না কি হয়। যদিও এটাও হবে অনুচিত। কারন এখানেও স'র উচ্চারণ কিন্তু আমরা ছ'র মতই করছি। স কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিজের উচ্চারণ ঠিক রেখেই ব্যবহৃত হয়। তবুও স'র বোঝা একটা কমাতে ওই সন্দগুলোতে শ'র বদলে স ব্যবহার না হয় করাই গেল। একই কাজ করতে গিতে তিন রকম স য় শ দরকারটা কি ? বলতে বা সুনতে যদি তিন স'র পার্থক্যের প্রয়োজন না হয়, তবে সুধু

লিখতে বা পড়তেই বা দরকার কি? এতে সুধু জটিলতা বাড়ে। না হয় সুদ্ধ, না হয় অসুদ্ধ। যেমন ধরা যাক সাদা সন্দটির কথা। আমরা জানি, সাদা সন্দটি স দিয়েই লেখা হয়ে থাকে। অভিধানেও কিন্তু তাই পাওয়া যায়। কিন্তু যখন দেখি বাঙলা সাহিত্যেই অন্যতম কবি সামসুর রাহমান সাদা লিখতে গিয়ে শ ব্যবহার করছেন তখনতো বিভ্রান্ত না হয়ে উপায় নেই। কোনটা ঠিক? অভিধান, না কবি সামসুর রাহমান? আর পুলিশ বানান লিখতে গিয়ে স এবং শ উভয়ই ব্যবহার করছি। এখানে কথা হতে পারে পুলিশ সন্দটি খোদ বাঙলা নয়। বিদেশি। হোকনা। তাহলেতো আরো সুবিধাই হল। তবে বাঙলাতে যখন সন্দটি ব্যবহার করতেই হচ্ছে তখন এটাকেও একটা বাঙলা সন্দ হিসেবে স্বিকৃতি দেবার সময় বোধ হয় এখন এসেছে। উদাহরনের ফিরিস্তি বাড়াতে গেলে অনেক বাড়ানো যাবে। কিন্তু তাতে সুধু লেখার কলেবরই বাড়বে।

এখানে একটা কথা হতে পারে যে, কিছু কিছু সন্দ আছে যেগুলো এককভাবে লিখতে বা পড়তে গেলে মানে বুঝতে অসুবিধা হতে পারে। যেমন, সাপ শ//প, সব শ/ব। এখানে সাপ মানে সর্প, এবং শ//প মানে অভিসাপ। আবার সব মানে সবকিছু এবং শ/ব মানে লাস। এসব ক্ষেত্রে যদি মানে বুঝতে অসুবিধাই হয়, তবে কলা, তাল, পদ, দল, ছত্র, হাল, বাসর, বাঁধা, বাগ, বিধি, বর, কর, কদম এই সন্দগুলোর মানে কিভাবে বুঝবে? কলা মানে কদলি, সিল্প, চন্দ্রগ্রাসের চিত্র অথবা ছলনা হতে পারে। আবার তাল মানে সুস্বাদু ফল, সঙ্গিত বা নৃত্যের তাল হতে পারে। পদ মানে চরন, কবিতা, পদবি হতে পারে। দল মানে পাপড়ি, জনগোষ্ঠি বা সম্প্রদায় হতে পারে। ছত্র মানে অল্প বিতরনের স্থান (অল্পছত্র), পঙ্ক্তি বা লাইন অথবা ছাতা হতে পারে। হাল মানে লাঙ্গল, নৌকার হাল, অবস্থা অথবা আধুনিক হতে পারে। বাসর মানে বিবাহ রজনী ঘর, দিবস হতে পারে। বাঁধা মানে বন্ধক, দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়ে পারে। বাগ মানে বাগান, সাসন বা বঙ্গা হতে পারে। বিধি মানে বিধান বা নিয়ম, সৃষ্টিকর্তা বা ইস্বর হতে পারে। বর মানে বিয়ের পাত্র বা স্বামি, দেবতা বা গুরুজন কর্তৃক প্রাপ্ত আদির্বাদ হতে পারে। আবার বিসেষন হিসেবে উত্তম বা শ্রেষ্ঠও হতে পারে। যেমন, বন্ধুবর। কর মানে উতপাদক বা নির্মাতা হতে পারে, কিরন বা রশ্মি হতে পারে, হাত বা রাজস্ব হতে পারে। কদম মানে একধরনের ফুল, চরন অথবা পদক্ষেপ হতে পারে। তাহলে নির্দিষ্ট স না দিলে যে অর্থ বোঝা একেবারেই অসম্ভব এ কথা ধোপে টিকছেন। এ জটিল সমস্যার সমাধান কেবল পন্ডিতজনেরাই দিতে পারেন। বলতে বা সুনতে কিন্তু স নিয়ে কোন সমস্যা নেই। সুধু লিখতে বা পড়তে গেলেই যত ঝামেলা। মুখে বললে যদি অর্থ বুঝতে অসুবিধা না হয়, তবে লিখতে বা পড়তে গেলে সমস্যাটা কোথায়? সমস্যা ভাবলেই সমস্যা। মেনে নিলে কোন সমস্যা নেই। সুধু একটু অভ্যাসের পরিবর্তন করতে পারলেই হল। তাহলে দেখা যাচ্ছে তিনটি স'র পরিবর্তে দুটি স দিয়েও বাঙলা ভাষা চলতে পারে। আর সে ক্ষেত্রে শ/বাদ দেয়াই বোধ হয় সহজ। এখানে আর দুটো অক্ষরের কথা বলি, ঋ এবং ৯। বিদ্যাসাগর বাঙলা লিপিমালায় এ অক্ষর দুটোকে জুড়ে দিয়েছিলেন অবস্যই কোন প্রয়োজনে। কিন্তু সে প্রয়োজন এখন আর নাই। তাই অক্ষরদুটিও নেই। এছাড়া বাঙলা লিপিমালায় যে দুটো ব আছে তা আমরা ক'জন জানি? আমাদের একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, মানুষের জন্যই ভাষা, ভাষার জন্য মানুষ নয়। যুগে যুগে মানুষ তার প্রয়োজনে ভাষাকে পরিমার্জন বা আধুনিকায়ন করেছে এবং ভবিষ্যতেও করবে। এই কাজটি প্রধানত কবি সাহিত্যিক বা লেখকরাই করে এসেছেন। পন্ডিতরা সুধু সক্ত হাতে সুষ্ঠুভাবে ধারণ করার কাজেই নিয়োজিত থেকেছেন। এবং এই জন্যই উদ্ভব হয়েছিল ব্যাকরণের। ভাষার জন্যই ব্যাকরণ। ব্যাকরণের জন্য ভাষা নয়। সাহিত্য সঙ্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক *নতুন দিগন্ত* পত্রিকার প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সঙ্খ্যায় (জানুয়ারি-মার্চ ২০০২) সিরাজুল ইসলাম চৌধুরি *বাংলা বানানে অন্যান্য হস্তক্ষেপ* প্রবন্ধে বলতে চেয়েছেন যে, ইংরেজি ভাষায় কোন আধুনিকায়ন বা প্রমিতকরণ কখনো হয়নি। তারা এটা পছন্দ করে না। কিন্তু বাঙলা ভাষা তো অন্য কোন ভাষার পদাঙ্ক অনুসরণ করেনা। অন্য কোন ভাষা যদি তার অজস্র অসঙ্গতি যুগ যুগ ধরে পুষে রাখে, তাই বলে কি বাঙলাকেও পুষে রাখতে হবে? সে কি কখনো আধুনিক হবেনা? বাঙলা ভাষার আধুনিকায়নের ক্ষেত্রে সুধু দৃষ্টিভঙ্গি আর মানসিকতা পরিবর্তন করাই যথেষ্ট। ব্যাকরণ আর ধ্বনিতত্ত্বের কঠিন আবর্তে থেকে আধুনিকায়ন সম্ভব নয়। এ জন্য চাই ইচ্ছেসক্তি বা বিপ্লব। এই বিপ্লব না ঘটালে বাঙলা ভাষায় সুদ্ধ আর অসুদ্ধ পাসাপাসি চলতেই থাকবে অনন্তকাল। অথবা প্রতিটি বাঙলা ভাষাভাষিকে ভাষায় পন্ডিত হতে হবে। আর নাহয় সবাইকে একটি করে অভিধান বগলদাবা করে সবসময় চলতে হবে। প্রয়োজনে অভিধান বা ব্যাকরণ পরিবর্তন করা যায়, কিন্তু সময়ের সাথে সাথে ভাষার আধুনিকায়ন ঠেকানো, বালির বাঁধ দিয়ে খরস্রোতা নদিকে ঠেকিয়ে রাখার মতই বৃথা পন্ডস্রম। এখানে ডঃ মুহম্মদ সহিদুল্লাহ'র একটি

উদ্ধৃতি উল্লেখ করা যায়। তিনি বলেছেন, *নদীর গতিপথ যেমন নির্দেশ করে দেওয়া যায় না, ভাষাও তেমনি। একমাত্র কালই ভাষার গতি নির্দেশ করে। ভাষার রীতি (স্টাইল) ও গতি কোন নির্দিষ্ট ধরা বাঁধা নিয়মের অধীন হতে পারে না।* সময়ের প্রয়োজনে ভাষা সকল বাঁধ ভেঙ্গে তার নিজস্ব গতি খুঁজে নেবেই। এখানে *দৈনিক জনকণ্ঠ*-এর একসঙ্গে ফেব্রুয়ারি সুবর্ণ জয়ন্তি ২০০২ সঙ্খ্যা'র পৃষ্ঠা ১৪ তে মাহবুবুল হক রচিত প্রবন্ধ *বাংলা বানান সংস্কার ও প্রমিতকরণের অর্ধশতক* থেকে একটা উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। তিনি লিখেছেন, *১৯৩০-এর দশকে বাংলা বানানের নিয়ম প্রণয়নে উদ্যোগী ভূমিকা রাখেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর অনুরোধে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানানবিধি প্রণয়নে এগিয়ে আসেন। বিশ্ববিদ্যালয় নিয়োজিত বানান সমিতির সুপারিশ হিসেবে বাংলা বানানের নিয়ম প্রকাশিত হয় ১৯৩৬-৩৭ সালে। রক্ষণশীল কিছু পণ্ডিত এর বিরোধিতা করেছিলেন। তবে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের মত জনপ্রিয় লেখক ঐ নিয়ম অনুসরণ করে বানান লিখতে সম্মত হলে ঐ নিয়ম চালু করার অনুকূল পরিবেশ তৈরী হয়। ১৯৩৭ এর পরে প্রকাশিত সব অভিধানে ঐ বানান বিধি গৃহীত হওয়ায় বানানে মোটামুটি শৃঙ্খলা আসতে থাকে।* রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র উভয়েই ছিলেন মূলত সাহিত্যিক। ভাষাবিদ হিসেবে তাঁদের আমরা প্রথমেই চিহ্নিত করি না। তখন কিন্তু অনেক বড় বড় ভাষাবিদ বা পণ্ডিত ছিলেন, যাদের নাম এবং অবদান আমরা আরো বহুদিন স্রদ্ধার সাথে স্মরণ করব। কাজটি কিন্তু তাঁরাও করতে পারতেন। কিন্তু পারেননি। পেয়েছেন কবি সাহিত্যিকরাই। কবি সাহিত্যিকদের কোন সমাবদ্ধতা নেই। তাদের কলম মুক্ত। তাদের ভাবনা অব্যাহত। মুক্ত চিন্তা ছাড়া সুধু ভাষাই না, কোন কিছুই প্রসার ঘটেনা। এগিয়ে যেতে হলে খাঁচা ভেঙ্গে বেরিয়ে আসতেই হবে। আর এজন্যে মস্তিষ্কের চর্চার পাসাপাসি হৃদয়ের চর্চারও প্রয়োজন।

আমার এই মতামত বাস্তবায়িত করার জন্য আমি আমার লেখায় ঙ্গ উ গ শ ং এই পাঁচটি অক্ষর আর ব্যবহার করছি।

১৮.৩.২০০২

কল্যানপুর, ঢাকা

তোমার আমার বাঙলা বানান

সৈসব থেকেই একটা চেতনা আমাকে নাড়া দিয়ে আসছে। চেতনাটি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ক্ষেত্রে মাথাচাড়া দেয়। প্রকাশ পেতে চায়। প্রকাশ করতে গিয়ে ছোটবেলায় হাতে তুলে নিয়েছিলাম রঙ-তুলি। মনে আছে, বেস প্রসঙ্গসা পেয়েছিলাম। কিন্তু ধরে রাখতে পারলাম না। যৌবনে এসে নাটক পাগল হলাম। সুধু মঞ্চগভিনয়ই নয়, পাশাপাশি আবৃত্তি। সুধু প্রসঙ্গসা আর হাততালিই নয়, অনেকগুলো পুরস্কারও জুটে গেল। দৃষ্টি পড়ল সিনেমার পর্দায়। পড়াসুনায় ভাটা পড়ল। সিনেমাতে অভিনয় করাই মনে হল জীবনের একমাত্র কাজ। কিন্তু না। কিছুদিনের ভিতর বুঝতে পারলাম, সিনেমাতে অভিনয় করাটা আসলে কিছুনা। আমার চেতনাগুলোকে প্রকাশ করতে হলে সিনেমাকে হাতিয়ার হিসেবে নিতে হবে। কারন সিনেমাই হচ্ছে সিল্প সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম। কিছুদিন প্রসিদ্ধির পর নিজেই সিনেমা পরিচালনার কথা ভাবলাম। লিখে ফেললাম চিত্রনাট্য। কিন্তু তারপর আর হলনা। পড়ে রইল আমার চিত্রনাট্য।

অনেক ক'টা বছর পেরিয়ে গেল। ধুলো জমতে থাকল আমার চিত্রনাট্যের পাতায়। কিন্তু মাথার ভিতর থেকে পোকাটা তাড়াতে পারলাম না। বারবার আমার চেতনাগুলোকে দাবড়িয়ে নিয়ে বেড়াতে লাগলো ওই পোকাটা। এখন কি করি? ভাবতে ভাবতে ছোটদের জন্য লিখে ফেললাম রূপকথার ছলে একটা ছোট বই *কেমন করে স্বাধীন হলাম*। তারপর একদিন মনে হল, আমার সেই চিত্রনাট্যটাকে উপন্যাসে রূপ দিলে কেমন হয়। কিন্তু উপন্যাস! সে তো আরেক জগত। কিছু কিছু উপন্যাস মনযোগ দিয়ে পড়া শুরু করলাম। তারপর একসময় চিত্রনাট্যটার ধুলো ঝেড়ে মুছে, ওটাকে উপন্যাসের মত করে লিখতে বসলাম। কিন্তু প্রথমেই হোচট খেলাম বাঙলা বানান নিয়ে। এতো এক মহা ফ্যাসাদ। বাঙলা সাহিত্যের নন্দিত সব কথা সাহিত্যিক, তাঁদের লেখার ভিতর খুঁজে পেলাম বানানের বিভিন্ন অমিল। এখন কি করি? বাঙলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি সামসুর রাহমান *সাদা* লিখেছেন *শ* দিয়ে *শাদা*। সৈয়দ সামসুল হক লিখেছেন *শ* দিয়ে *শাদা* তার কবিতায়। ডঃ হুমায়ুন আজাদ লিখেছেন *শ* দিয়ে *শাদা* তার *আমরা কি এই বাঙলাদেশ চেয়েছিলাম* বইটিতে। আরো পেয়েছি। যেমন, দারুন একটাই উপন্যাস *উড়ুল*। উপন্যাসিক নাসরিন জাহান তার উপন্যাসটিতেও লিখেছেন *শ* দিয়ে *শাদা*। অভিধানে পাচ্ছি *স* দিয়ে *সাদা*। আমি কি লিখব? অভিধান মানবো, নাকি কবি সামসুর রাহমান। তারপর এল *জরুরি* সন্দটি। এটা লিখতে গিয়ে ই-কার, ঙ্গ-কার উভয়ই ব্যবহৃত হচ্ছে। বাড়ি, গাড়ি, পাখি এগুলোর ক্ষেত্রেতো ই-কার না ঙ্গ-কার হবে তা নিয়ে কারো কোন মাথা ব্যথা নেই। ফ্রি স্টাইলে চলছে। *সরকারি* সন্দটির বানান লিখতে সরকার নিজেই বোধহয় দ্বিধাগ্রস্ত। *ভুল* সন্দটি লিখতে গিয়ে হয়তোবা আমাদের জীবনভর ভুল আর সুদ্ধ পাশাপাশি চলতেই থাকবে। উ-কার দিয়ে লিখলে বোধহয় ছোট ভুল আর ঙ্গ-কার দিয়ে লিখলে হয়তোবা বড় ভুল। ঙ এর ক্ষেত্রেতো কোন কথাই নেই। ন ঙ একটা হলেই হল। মাঝে মাঝে মনে হয় ন যদি দুটো থাকতে পারে তাহলে ম কেন দুটো হল না। ঙ এর ব্যবহার বড় বিচিত্র বলে মনে হয়। *রং চং* এগুলো লিখতে গিয়ে ঙ ব্যবহার করছি, আর যখনই রঙের বা চঙের লিখছি তখন ডাক পড়ছে ঙ এর। সেদিন চোখে পড়লো বৈসাখি বানান। ১৬ এপ্রিল, ২০০৩ তারিখের *দৈনিক ইত্তেফাক* লিখেছে, *কালবৈশাখী*। *রাজধানীতে দেয়াল ধসে শিশুসহ ৪ জনের মৃত্যু*। একই দিন প্রথম আলো লিখেছে, *কালবৈশাখিতে প্রাচীর ভেঙে ২ বোনসহ ৪ জনের মৃত্যু*। আমি এখন কি করব? বৈসাখি বানানটিতো আমাকেও লিখতে হবে। আমি কি ই-কার দেব, নাকি ঙ্গ-কার দেব। অভিধান খুলে দেখি ঙ্গ-কার দেয়া আছে। কিন্তু *প্রথম আলো* দেসের একটি প্রধান পত্রিকা। তার কথাও ফেলে দেই কিভাবে। ভাবলাম বৈসাখি লিখতে যদি ই-কার দেয়া হল, তবে প্রাচীর বানানে কেনই বা ঙ্গ-কার রয়ে গেল? এমনি উদাহরণের শেষ নেই। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে বাঙলা বা বাঙালি সন্দটি আমরা চার এবঙ ছয় রকম লিখছি। যেমন বাংলা, বাঙলা, বাঙ্গলা, বাঙ্গালা আবার বাংগালি, বাংগালী, বাঙালি, বাঙালী, বাঙ্গালি, বাঙ্গালী। হয়তোবা সবগুলোই সুদ্ধ। কিন্তু তাই বলে কি একটা ঠিক করে নেয়া যায় না? এবঙ তাহলেই কি বাঙালির পারস্পরিক একাত্মতা, অন্তত ভাষা চর্চার ক্ষেত্রে দৃঢ় হয়না? এখানে

একটা উদাহরণ দেই। বর্তমান বাঙলা সাহিত্যের অন্যতম দিকপাল সুনিল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর **পূর্ব-পশ্চিম** উপন্যাসটির ৩৪৬ পৃষ্ঠার এক জায়গায় লিখেছেন, *বাঙ্গালী শুধু পলিটিস্ক্র আর মাস্টারি করতেই জানে। এখন ব্যবসায় ঝাপিয়ে পড়াই হবে তোর আমার মতন বাঙালীর বেস্ত পলিটিস্ক্র।* একই উপন্যাসের ৩৬৪ পৃষ্ঠায় আবার তিনি লিখছেন, *আমি ভাগলপুরের বাঙালীদের ইস্কুলে কিছুদিন পড়ালিখা করেছিলাম। এখানে একই লেখকের লেখাতেই পাচ্ছি তিন রকম বানান।*

বাঙালি সন্দটির আরো কয়েকটি উদাহরণ দেয়া যাক। হায়াৎ মামুদের লেখা একটি বই **বাঙালির বাংলা ভাষা ইদনীং**। আব্দুল্লাহ আবু সায়িদ রচিত একটি বই, **সংগঠন ও বাঙালি**। মইনুদ্দিন খালেদ তার একটি বইয়ের নাম রেখেছেন এভাবে, **দশ বাঙালি শিল্পী**। এবার **প্রথম আলো** থেকে উদাহরণ। ৬ জুন ২০০৩ সূত্রবারের সাহিত্য সাময়িকিতে ২১ ও ২২ পৃষ্ঠা জুড়ে **অমর একুশে বইমেলা ২০০৩ এর নির্বাচিত ১০ মননশীল বই** সিরোনামে বিসাল আলোচনা ছাপা হয়েছে। এখানে যাঁরা আলোচনা করেছেন, তাঁরা হচ্ছেন, অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকি, এ জেড এম আবদুল আলি, সৈয়দ আবুল মকসুদ, আবুল মোমেন, মফিজুল হক, সফি আহমেদ, মাসুদুজ্জামান, আহমদ মাযহার, মারুফ রায়হান ও আমিনুল এহসান। দসটি বই নিয়ে দসটি আলোচনায় আমার চোখে ছাব্বিস বার **বাঙালি** সন্দটি ধরা পড়েছে এবং ছাব্বিস বারই বানানটি লেখা হয়েছে, **বাঙালি** এভাবে। এছাড়া *সরকারি, একাডেমি, ফেক্রয়ারি, জরুরি*, সন্দগুলো লিখতে ই-কার ব্যবহার করা হয়েছে। ৩০ মে ২০০৩ তারিখের **প্রথম আলো** পত্রিকায় মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান **বাঙালির ভাব-ভাষার দৈন্য** সির্ষক একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। তার লেখায় **বাঙালি** সন্দটি তিনি লিখেছেন এভাবে **বাঙালি**। আবার একাডেমি লিখেছেন ঙ্কার দিয়ে।

কবি সামসুর রাহমানের একটি বিখ্যাত লেখা **কালের ধুলোয় লেখা, দৈনিক জনকর্ষ**-এ আমরা অনেকেই পড়েছি। তার এই লেখায় **বাঙালি** সন্দটি দুই ভাবেই এসেছে। **বাঙালি** এবং **বাঙালী**। এটা ছাপার ভুলও হতে পারে। উদাহরণ-১৬ আগস্ট ২০০২ এবং ২৩ আগস্ট ২০০২ এর **দৈনিক জনকর্ষ**। ছাপার ভুল হোক আর যাই হোক আমাদের কারও কিন্তু তাতে মানে বুঝতে কোন অসুবিধা হয়নি।

৭ সেপ্টেম্বর ২০০২ সালে জাতিয় প্রেস ক্লাবে **বাঙালি সমগ্র** সঙগঠন আয়োজিত এক সঙবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন কবি সামসুর রাহমান এবং অধ্যাপক আনিসুজ্জামান। ওই সম্মেলনের ব্যানারে দুইবার **বাঙালি** সন্দটি লেখা হয়েছে এভাবে, **বাঙালি**। প্রমান- ৯ সেপ্টেম্বর, ২০০২ এর **দৈনিক জনকর্ষ**।

অভয় বাজে হৃদয় মাঝে, ওয়াহিদুল হকের একটি বিখ্যাত কলাম। বিখ্যাত ওই পত্রিকার একটি সঙখ্যায় তার কলামের সিরোনাম এসেছে এভাবে, **জাগো বাঙ্গালী জাগো**। ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০০২ তারিখের **দৈনিক জনকর্ষ** সাময়িকিতে ইসরাইল খানের একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছে, **বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের অবদান**, এই সিরোনামে। লেখাটিতে আবদুল করিম সাহিত্য বিসারদের কিছু উদ্ধৃতিসহ লেখকের কিছু বানান উল্লেখ করা যেতে পারে। বানানগুলো এসেছে এভাবে, **বাঙালী, বাঙালি, বাঙালা, বাঙলা, বাঙ্গালা, বাংলা।**

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরি **নতুন দিগন্ত** নামে একটি চমতকার সাহিত্য সঙস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক সম্পাদনা করে থাকেন। জানুয়ারি-মার্চ, ২০০২ এ প্রকাশিত ওই ত্রৈমাসিকের প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সঙখ্যায় **বাংলা বানানে অন্যায হস্তক্ষেপ** নামে তার লেখা একটি মূল্যবান প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে। ওই প্রবন্ধ থেকে প্রাসঙ্গিক দু-একটি কথা এখানে বলা যেতে পারে। তিনি লিখেছেন, *বাঙালী সব সময়ই ী যুক্ত ছিল। ও ভাবে এতকাল লিখে এসেছি, আমার বাবা লিখেছেন, তাঁর বাবাও লিখেছেন। ওই বানান ইতিহাস নয় কেবল, আমাদের ঐতিহ্যও।* তার এই কথা মানতে হলে ইতিহাস রক্ষা করতে আমাদের ফিরে যেতে হয় চর্যা পদের ভাষায়। কাঙ্ক্ষুপাদ বা কুঙ্কুরি পাদের ভাষায়। বিদ্যাসাগরের আদর্শ লিপিতে

আমার বাবা, দাদা ৯ আর ৯ দুটি অক্ষর সিখে এসেছেন। ঐতিহ্য রক্ষা করতে কি আমরা অক্ষর দুটি আবার ব্যবহার করা শুরু করব। ৯ দিয়ে লিখব ৯ছ ? নাকি বেত্রাঘাতে কোমলমতি সিসুদের সাধু ভাষায় ফিরে যেতে বাধ্য করব? তিনি লিখেছেন, *বাঙালী কে বাঙালি বানানে যতবার দেখি ততবারই মনে হয় ি-কারকে হুস্ব করে বাঙালীকেই খাটো করা হচ্ছে, সে হুস্ব হচ্ছে। ি-কার দিয়ে বাঙালি লিখলে বাঙালি খাটো হয়ে যাবে, হুস্ব হয়ে যাবে। আর ি-কার ব্যবহার করলেই বাঙালি বুক টান করে দাড়িয়ে যাবে। এ সঙ্গার ব্যাখ্যা আমার জানা নেই। বাঙালি কখনই খাটো বা হুস্ব নয়। বাঙালিকে খাটো বা হুস্ব ভাবা একধরনের হিনমন্যতারই বহিঃপ্রকাশ।*

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম লিখেছেন, *কিন্তু আমি না মানলে কি হবে, পত্রিকার সম্পাদক, কম্পিউটার কর্মী, প্রফ সংশোধক সকলেই মেনে নিয়েছেন। বাঙালী বানান যতবার বাঙালী লিখি ততবারই দেখি সংশোধিত হয়ে গেছি। তাঁর এই কথায় প্রমাণ হয় যে সময়ের সাথে সাথে ভাষাও সামনে এগিয়ে চলে। তাকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। সব কম্পিউটার কর্মি বা প্রফ সংশোধককে কি ব্যাকরণ বিসারদ বানানো সম্ভব হবে?*

তিনি রবিন্দ্রনাথের বানানে ি-কারের স্থলে ি-কার স্থাপনের আসঙ্কা প্রকাশ করেছেন। *রবি+ইন্দ্র = রবীন্দ্র*। সন্ধি বিচ্ছেদ সঠিক। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু যার পক্ষে এ সন্ধি বিচ্ছেদ মনে রাখা সম্ভব হলনা, তিনি কি রবিন্দ্র সন্ধটি কোথাও লিখবেন না। অথবা তিনি কি কম্পিউটার কর্মি বা প্রফ সংশোধক হবার অধিকার হারাবেন? অজ্ঞতাবসত হোক অথবা প্রফ দেখার ভুলই হোক, ি-কার দিয়ে *রবিন্দ্রনাথ* লিখলে মানে বোঝার কোন সমস্যা হবার কথা নয়। বাঙলা ভাষায় কি একই নাম একাধিক ব্যক্তির থাকে না? ি-কার না থাকলে চন্ডিদাস নিয়েও সমস্যা হতনা।

আমার কাছে মনে হয়েছে বাঙলা, বাঙালি আর বাঙলাদেশ এই তিনটি সন্ধের বানানে মিল থাকাই বাঞ্ছনীয়। সে ক্ষেত্রে বাঙলাদেশ লিখতে গিয়ে ঙ ব্যবহার করতে কোন বাধা নেই। কিছু কিছু ক্ষেত্রে লেখা হচ্ছেও। যেমন, হুমায়ুন আজাদ তার একটি বইয়ের সিরোনাম লিখেছেন এভাবে, *আমরা কি এই বাঙলাদেশ চেয়েছিলাম*। সুনিল গঙ্গোপাধ্যায় তার *পূর্ব-পশ্চিম* উপন্যাসের ৪৩০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন *তারা আলোচনা করছে বাঙলাদেশ নিয়ে।*

আমার দৃষ্টি কাড়লো মোট পাঁচটি অক্ষরের উপর। এগুলো হচ্ছে ঙ, উ, ণ ং, শ। এই অক্ষরগুলো ব্যবহার করতে গিয়েই যত বিপত্তি। এখন আমি কি করব? একবার মনে হল অভিধান মানাইতো উচিত। কারন, অসুন্দ বানান কারো জন্য কাম্য নয়। আবার অভিধান মানতে গিয়ে মনে হল সময়ের স্রোতের কাছে পিছিয়ে পড়তে হবে। মনে হল, বাঙলা ভাষা ধীর গতিতে হলেও নিরবে, অজান্তে আধুনিকায়নের পথে যাচ্ছে। যারা বিভিন্ন রকম বানান লিখছেন তাদের ভিতর রয়েছেন গুনিজন। আবার রয়েছে দেশের নামকরা সব পত্র পত্রিকা। তবে অনেক ক্ষেত্রে অজ্ঞতাবসতও হয়ে চলেছে। তবে যে ভাবেই হোক, কাজ কিন্তু খেমে নেই। চলছেই। কেউ বানান নিয়ে তেমন একটা মাথা ঘামাচ্ছেনা। এমন একটা ভাব, বানানে কি এসে যায়, কাজ চললেই হল।

আমার কাছে মনে হল, প্রতিটি বাঙালির ভাষাই বাঙলা। সবাই বাঙলায় কথা বলে, সোনে, লেখে, পড়ে। নিরক্ষর লোকের কথা না হয় বাদই দিলাম। সিক্ষিত সমাজের কথা ভেবেই কথা বলা যাক। আমরা যখন কথা বলি বা সুনি, তখন কিন্তু আমরা কেউ বানান নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাচ্ছি না। বাঙলা লেখা কোনকিছু কেউ পড়ে সোনালে বা রেডিও টিভিতে বাঙলা খবর সোনার সময় কাগজের পাতায় কি বানান লেখা আছে তার খবর জানার কোন প্রয়োজন পড়ে না। অথচ যা বলা হচ্ছে বা সুনছি তাও বাঙলা। মানে বুঝতে কারো কোন অসুবিধা হচ্ছে না। তা হলে বানান সমস্যা সুধু মাত্র লেখা বা পড়ার সময়ই ধরা পড়ছে। তাও আবার লিখতে গিয়ে যতটা, পড়তে গিয়ে ততটা না। তবে ধরা পড়ছে কাদের কাছে? যারা বানান সম্পর্কে সচেতন। গুনিজন। পণ্ডিত। তারাই ভুলটা ধরতে পারছেন। আমাদের মতন সাধারণ মানুষ বানান ভুল নিয়ে মোটেই মাথা

ঘামাচ্ছে না। তা হোকনা অজ্ঞতাবসত। দেশের প্রতিটি মানুষই সুসিদ্ধিত হবে বা সবাইকে বানান সচেতন হতে হবে, তা কি আসা করা যায়? তাই বলে কাজ কিন্তু থেমে নেই।

আগেই বলেছি নিরক্ষর লোকের কথা বাদ রাখছি। কারণ বানান সমস্যা শুধু মাত্র সিদ্ধিতদের জন্যে। তা সজ্ঞায় কারা বেসি? অর্থাৎ, বাঙলা ভাষা লেখা পড়ায় ব্যবহার করছি এমন মানুষের মধ্যে কাদের সজ্ঞা কত? আলোচনার সুবিধার জন্যে সাদামাটা ভাবে আমরা তিনটি ভাগে ভাগ করতে পারি। ১) পন্ডিত বা গুনিজন ২) সাধারণ সিদ্ধিত ৩) অল্প সিদ্ধিত। চুলচেরা পরিসজ্ঞানে না গিয়ে মোটামুটি ভাবে বলা যায়, বাঙলা ভাষায় পন্ডিত বা গুনিজন অত্যন্ত সচেতনভাবে ভাষার চর্চা করে থাকেন। তাঁরা চান সবাই বানানের প্রতি সচেতন থাকুন। তাঁদের এই চাওয়া অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু তাদের থেকে সজ্ঞায় বেসি সাধারণ সিদ্ধিত মানুষ, যারা অফিস-আদালত, ব্যবসা-বানিজ্য বা অন্যান্য ক্ষেত্রে বাঙলা ভাষা লেখা পড়ায় ব্যবহার করেন। তারা কি সুদৃঢ়ভাবে বানান চর্চা করছেন বা করতে পারছেন? তারা কি *সরকারি* সন্দে একবার ই-কার আরেকবার *ঈ-কার* ব্যবহার করছেন? তারা কি *কারণ* বা *করণ* লিখতে গিয়ে দু'টি ন নিয়ে তালগোল পাকাচ্ছেন না। সরকারি সঙ্স্থার গাড়িতে *জরুরি* বানান *ঈ-কার* দিয়ে লেখা হলেও দেশের নামকরা পত্রিকাতে ই-কার ব্যবহার করা হচ্ছেই বা কেন? বাড়ি ভাড়ার বিজ্ঞপ্তি বা গাড়ি কেনা বেচার বিজ্ঞপ্তি দেখলে একথা বিশ্বাস করতেই হবে যে, বহুদিন আগে রবিন্দ্রনাথ বাড়ি, গাড়ি আর পাখি বানানে ই-কার ব্যবহার করে গেলেও আজও আমরা এই তিনটি বানান কিভাবে লিখব তা ঠিক করতে পারলাম না। স্কুল কলেজের কথাই বা একেবারে বাদ দেব কেন? সিদ্ধিতরা কি সব ক্ষেত্রে নির্ভুল বানান সিদ্ধিতদের সেখাতে পেরেছেন? সিদ্ধিতরা কি পরিষ্কার খাতায় নির্ভুল ভাবে বাঙলা লিখতে পারছে? তবুও ওরা পাস করেছে। বড় বড় অফিস আদালতের দায়িত্ব নিচ্ছে। তবুও অফিস-আদালত আর ব্যবসা-বানিজ্য চলছে। এবার অল্প সিদ্ধিত মানুষের কথায় আসা যাক। ধরা যাক অল্প সিদ্ধিত মানুষ জব্বর মিয়া। তিনি ঢাকা সহরে কাজ করেন। নববধুর কাছে চিঠি লিখতে গিয়ে লিখছেন, *প্রীয় বাসন্তি, প্রিতী নিও। ইদের ছুটিতে বাড়ী যাবার সময় তোমার লাল সাড়ি আর শাদা পেটিকোট গিয়ে যাব।* উত্তরে নববধু বাসন্তি লিখেছে, *ওগো আমার প্রাণপ্রীয় শ্বামি, জিবণে আমি সুধু তোমাকেই চাই। আমি তোমাকে সব সময় স্মরণ করি। সাড়ি নিল রংয়ের হলেও হবে। ঈতি তোমারই প্রেয়সি বাসন্তি।* জব্বর মিয়া বা বাসন্তির চিঠির বানান দেখে আমরা হয়তোবা হাসবো। কিন্তু চিঠির মাধ্যমে তাদের যে মনের আবেগ বা ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে, তাকে ছোট করে দেখার বোধ হয় কোন অবকাশ নেই। সুদৃঢ় বানান না জানার কারণে সুসিদ্ধিত সমাজ বিদ্রুপ বা কটাক্ষ করলেও তাদের পত্র বিনিময় কিন্তু চলবেই।

এখন কি করব? সাধারণ সিদ্ধিতকে বানান সেখাবার স্কুল খুলব, নাকি অল্প সিদ্ধিতদের চিঠি লেখা নিসিদ্ধিত করব। এইসব চূপচাপ হা করে দেখতে থাকব আর মুখে বলতে থাকব আমার সোনার বাঙলা আমি তোমায় ভালবাসি অথবা আমার ভাইয়ের রঙে রাঙানো একুসে ফেরয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি। কিন্তু আমি তো একজন সাধারণ মানুষ। কোন পন্ডিত বা ভাষাবিদ নই। নই দেশের কোন একনামে চেনা মানুষ। আমার কথা কে সুনবে। একবার মনে হল, দূর ছাই, যে যেমন ইচ্ছে লিখুকগে, আমার কি? আমি প্রচলিত যে বানান চলছে, গুনিজন যেভাবে লিখে আসছেন, তাই লিখব। কিন্তু পারলাম না। বারে বারে মনের ভিতর একটা খচখচানি রয়েই গেল। বানানের এই গরমিল দেখে নিজের কাছেই একটা অপরাধবোধ সবসময় ঘুরাপাক খেতে লাগলো। নিজের মনের সাথে আপোষ করতে পারলাম না। মনে হলো এটাতো পুরো জাতির জন্যই একটা লজ্জা। ভাষাতো শুধু একটি জাতির গুটিকয়েক সুসিদ্ধিত গুনিজনের জন্যেই নয়। ভাষা সমগ্র জাতির আপামর মানুষের জন্য। যারা নিরক্ষর, তাদের জন্যে ভাষা শুধু বলা ও সোনার। কিন্তু যারা অল্প সিদ্ধিত, তাদের ভাষা চর্চার অধিকার থেকে বঞ্চিত করাও যাবে না। তাহলে বানান ভুলের এই মহামারি থেকে বাঁচার উপায় কি? যদি সত্যি সত্যি বাঙলা ভাষাকে এ দেশের প্রতিটি মানুষের প্রানের ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই, তাহলে বানান সমস্যা কাটিয়ে উঠতেই হবে। হয় প্রতিটি বাঙলা ভাষাভাষিকে সুদৃঢ় বানান সেখাবার পদ্ধতি আবিষ্কার করতে হবে, নইলে সহজ সরল পদ্ধতি সাধারণ মানুষকে উপহার দিতে হবে। সুদৃঢ় বানান এবং ভুল বানানের এই একত্রে বসবাস জাতির জন্য লজ্জাজনক।

রাতারাতি প্রতিটি সাধারণ সিদ্ধান্ত বা অল্প সিদ্ধান্ত বাঙলা ভাষাভাষিকে সুন্দর বানান সেখানের কোন পদ্ধতি আছে কিনা আমার জানা নেই। সেই চেষ্টা করতে গেলে অনেকটা হাতের চাষের মতই অবস্থা দাড়াবে। একদিকে লাঙ্গল চলবে আর অন্যদিকে হাতের পা'র চাপে মাটি সমান হতেই থাকবে। কারণ অল্প সিদ্ধান্ত বা বাচ্চাদের সিদ্ধান্তে নিয়োজিত সিদ্ধান্তকারী কি সবাই সুন্দর বানানে পারদর্শী। তারপর রয়েছে দেশকে নিরক্ষর মুক্ত করার মহাপরিকল্পনা। সে ক্ষেত্রে অগণিত বানান সচেতন সিদ্ধান্তকারী বা কোথায় পাওয়া যাবে? বইয়ে সঠিক বানান থাকা সত্ত্বেও সাধারণ সিদ্ধান্ত বা অল্প সিদ্ধান্তকারী যখন সঠিক বানান সিদ্ধান্তে পারলেন তখন নিরক্ষরদের কাছে কি তা আসা করা ঠিক হবে? অথবা আর একটা কাজ করা যেতে পারে, কঠিন আইন করে দেয়া যেতে পারে যে, বানান ভুল হলেই জেল-জরিমানা। কিন্তু তাতে আবার পুলিশের প্যাদানি খাওয়া বা পুলিশকে দক্ষিণা দেবার ভয়ে বানান সেখার প্রবণতা একেবারেই বন্ধ হয়ে যাবার সম্ভবনা থাকে। আর নাহয় আলাউদ্দিনের চ্যারণ একটা পাওয়া গেলে দৈত্যকে পুরো দেশের বাঙলা বানান সুন্দর করার কাজে লাগিয়ে দেয়া যায়। সেই চেরাগও পাবার কোন সম্ভবনা নেই।

আগেই বলেছি সাধারণত বাঙলা বানান ভুল হয়ে থাকে ঙ্গ, উ, গ্গ, ঙ্গ এই পাঁচটি অক্ষরের জন্যে। ঙ্গ, উ, গ্গ যতদিন জীবিত থাকবে ততদিন বানান ভুল থেকে বাঁচার কোন উপায় নেই। তাছাড়া শ্শ এবং ঙ্গ এর বদলে স আর ঙ দিয়ে যখন দিব্যি কাজ চালানো যায়, তখন ওদুটো বোঝাকে ধরে রেখে ঝামেলা বাড়িয়ে আর লাভ কি। তাহলে বাঙলা ভাষা সহজ ও সরল ভাবে লিখতে পড়তে আর বানান ভুলের হাত থেকে বাঁচতে এই পাঁচটি অক্ষর বাদ দেয়াইতো ভাল। ধুলো থেকে পা বাঁচাতে পুরো দেশের ধুলো ঝেটিয়ে বিদেশ করতে গিয়ে মহা বিপত্তি ঘটানোর চেয়ে মুচির পরামর্শ মত জুতো দিয়ে পা মুড়িয়ে নেয়াইতো বুদ্ধিমানের কাজ। বলতে আর সুনতে যদি বানান কোন বাধা হয়ে না দাঁড়ায় তবে লিখতে বা পড়তে কেন সমস্যা হবে। বাঙলা ভাষায় এমন বহু সন্দ আছে যার বানান এক, কিন্তু মানে একাধিক। যেমন, ময়না মানে ময়না পাখি হতে পারে, আবার ময়না তদন্তও হতে পারে। দান মানে পাত্র হতে পারে, আবার দান করাও হতে পারে। ছিপ মানে নৌকা হতে পারে, আবার মাছ ধরার ছিপও হতে পারে। তুলা মানে কার্পাস বা সিমুল তুলা হতে পারে, আবার দাড়ি পাল্লাও হতে পারে। তাহলে ঙ্গ এর বদলে ই, উ এর বদলে উ, গ্গ এর বদলে ন, শ্শ এর বদলে স আর ঙ্গ এর বদলে ঙ দিয়ে লিখলে মানে বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয়। তাছাড়া উচ্চারণের বেলায় স বা শ্শর উচ্চারণ যদি কোন সময় ছ'র মত হতে পারে তবে ই'র উচ্চারণ ঙ্গ'র মত আর উ'র ইউচ্চারণ উ'র মত হতে দোষ কোথায়। তবে স'র উচ্চারণ ছ'র মত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। কারণ ছ উচ্চারণের জন্য ছ'তো আছেই। স'র উচ্চারণ যদি ছ'র মত করতে হয়, তবে সোনা উচ্চারণ কি হবে ছোনা? সাহিত্য উচ্চারণ কি হবে ছাহিত্য? সমুদ্র উচ্চারণ কি হবে ছমুদ্র? সাত উচ্চারণ কি হবে ছাত? বিলাস উচ্চারণ কি হবে বিলাছ? বাতাস উচ্চারণ কি হবে বাতছ? সঞ্জাম উচ্চারণ কি হবে ছঞ্জাম? সঙবাদ উচ্চারণ কি হবে ছঙবাদ? সৌরভ উচ্চারণ কি হবে ছৌরভ? এমনভাবে স দিয়ে প্রায় সব বাঙলা সন্দের উচ্চারণই স'র মতই হয়। পক্ষান্তরে কিছু বিদেশি সন্দ যা বিদেশি ভাষা থেকে এলেও এখন সেগুলোও বাঙলা সন্দ। যেমন, সিন, সিনেমা, সিপাই, সিভিল, সিমেন্ট, সিল্ক, সিট, সিল ইত্যাদি। এ সন্দগুলোতে স ব্যবহারের পিছনে নিস্চই যুক্তি রয়েছে। কিন্তু ব্যবহারের ক্ষেত্রে স'র বদলে ছ ব্যবহার করলে কোন অসুবিধা হবার কথা নয়। এতে বানানের জটিলতা অনেক কেটে যাবে। এরপর গ্গ'র কথা। গ্গ'র বদলে ন ব্যবহারে একেবারেই সমস্যা নেই। এই অক্ষরটি যে এতকাল টিকে আছে কিভাবে, ভাবলে অবাক হতে হয়। সমস্যা ভাবলেই সমস্যা। মেনে নিলে সব ঠিক। একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে, ওই পাঁচটি অক্ষরের কারণে যে সমস্ত সন্দ যিনি ভুল বলে মনে করেন, তিনি কিন্তু সন্দটির মানে প্রথমেই বুঝে নিয়েছেন, পরে বানানের ভুল ধরেছেন। মানে বুঝতে না পারলে ভুল ধরলেন কিভাবে? তাই সাধারণ মানুষকে স্বস্তি দিতে, প্রতিটি বাঙলা ভাষাভাষির কাছে সহজ সরল ও নির্ভুল বানান উপহার দিতে ঙ্গ, উ, গ্গ, ঙ্গ এই পাঁচটি অক্ষর বাদ দিয়ে বাঙলা ভাষা চর্চা করাই তো ভাল। অনেকে আমাকে বলেছেন, এ কাজটি করতে গেলে সমস্যা বাড়বে। যেমন আছে তেমনি থাক। তাহলে এখন যেমন চলছে তাতে কি কোন সমস্যা নেই? যদি সমস্যা না মনে করি তাহলে কথাটা কি অনেকটা স্বার্থপরতার মত হয়ে গেলনা? অর্থাৎ যারা উচ্চসিদ্ধান্ত তারা নিভুল বানান চর্চা করবেন, আর যারা সাধারণ সিদ্ধান্ত বা অল্প সিদ্ধান্ত তারা ভুল লিখলো কি ঠিক লিখলো তাতে কার কি আসে যায়। তারা

উচ্চসিক্ষিত হলেইতো পারে। তাহলে সবাইকে হয় বাঙলায় পড়িত বা ভাষাবিদ হতে হবে নতুবা বাঙলা অভিধান একটা বোগলদাবা করে চলাফেরা করতে হবে।

ভাষা চিরদিন এক রকম থাকেনি। যুগে যুগে আধুনিকায়ন হয়েই চলেছে। ভবিষ্যতেও হবে। জিবনের সব ক্ষেত্রে যদি আধুনিকায়ন হতে পারে, তবে ভাষার ক্ষেত্রে কেন নয়? আধুনিকায়ন ঠেকিয়ে রাখা যায় না। মানুষের জন্যেই ভাষা, ভাষার জন্যে মানুষ নয়। ভাষার জন্যেই ব্যাকরণ। ব্যাকরণের জন্যে ভাষা নয়। ভাষার আধুনিকায়ন কিন্তু ব্যাকরণ বা ধ্বনিতত্ত্ব অনুসরণ করে কখনো সম্ভব হয়নি বা হবেওনা। ব্যাকরণ বা ধ্বনিতত্ত্ব প্রচলিত ভাষাকে সঠিক ভাবে ব্যবহারের দিক নির্দেশনাই দিয়ে থাকে। সত্ত্ব হাতে অনেকটা রেফারির ভূমিকা পালন করে থাকে। কিন্তু খেলার নিয়ম পরিবর্তন বা আধুনিকায়ন করা হলে রেফারিকে নতুন নিয়ম মেনেই চলতে হয়। নতুবা সেই রেফারিকে বিদায় নিতে হয়। পুরনো নিয়ম আকড়ে ধরে আধুনিকায়ন হয়না। এই পরিবর্তন বা আধুনিকায়ন সময়ের প্রয়োজনেই হয়ে থাকে। ব্যাকরণ বা ধ্বনিতত্ত্বকে আকড়ে ধরে কিন্তু ভাষার আধুনিকায়ন সম্ভব নয়। তাই বলে ব্যাকরণ, ধ্বনিতত্ত্ব বা অভিধান যে ভুল, তা কিন্তু মোটেই নয়। সেই হ্যালহেড সাহেবের পর রামমোহন রায়ই প্রথম বাঙালি যিনি বাঙলা ব্যাকরণ লিখেছিলেন। তবে ওই ব্যাকরণ ছিল ইংরেজি আর সঙ্কত ব্যাকরণের আদলে। তবে আজ পর্যন্ত বাঙলা ব্যাকরণ বিসারদ বা ভাষাবিদরা খুব যত্নের সাথে, অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত ভাবেই ব্যাকরণ বা ধ্বনিতত্ত্ব প্রনয়ন করেছেন। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ওই ব্যাকরণ বা ধ্বনিতত্ত্ব প্রতিটি বাঙলা ভাষাভাষির পক্ষে পুরোটা মেনে চলা সম্ভব হচ্ছেনা। অথবা একটু ঘুরিয়ে বলা যায়, বাঙলা ব্যাকরণ প্রতিটি বাঙলা ভাষাভাষির প্রয়োজন থেকে কোন কোন ক্ষেত্রে অনেকটা দূরে সরে আছে। অভিধানের সাহায্য নিতে গেলেও অনেক সময় পুরোটা সমাধান পাওয়া যায়না। যেমন অভিধানে গাড়ি, বাড়ি, পাখি বা সরকারি সন্ধ্যুলোতে ই-কার আর ঙ্গ-কার দুটোই সঠিক বলে দেখানো হয়েছে। অভিধান কিন্তু এখানে সততার পরিচয়ই দিয়েছে। কিন্তু আমাদের মত সাধারণ মানুষের জন্য প্রস্ন থেকেই যাচ্ছে, যা একটা সমৃদ্ধ ভাষার জন্য সম্মানজনক নয়। ইতিহাসের দিকে চোখ ফেরালে দেখা যাবে, ভাষা আধুনিকায়নের ক্ষেত্রে ভাষাবিদ বা পণ্ডিতরা যতটুকু না সফল হন তারচেয়ে অনেক বেশি সফল হন কবি-সাহিত্যিকরা। কারণ, তারা মুক্ত চিন্তার মানুষ। তাদের কলম আবারিত। আর তাই সাহিত্যের উপর ভর করেই যুগে যুগে ভাষার উত্তরন ঘটেছে। পক্ষান্তরে ভাষাবিদ বা পণ্ডিতজন কঠিন নিয়ম-কানূনের গন্ডিতে আবদ্ধ। নিয়মের গন্ডি পেরিয়ে নতুন কিছু ভাবতে গিয়ে তাঁরা ন্যায় অন্যায়ের ভাবনায় তাড়িত হন অহর্নিশ। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরি রচিত *বাংলা বানানে অন্যায় হস্তক্ষেপ* প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, *ভাষাতো কারো ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত সম্পত্তি নয়, কেবল একালের মানুষেরও সম্পত্তি নয়, বহুকালের এবং অনাগত কালেরও; ওইখানে হাত দেওয়ার দুঃসাহসটা কেন?* ভাষা আকাশ থেকে পড়েনি। ভাষা মানুষেরই সৃষ্টি। যুগে যুগে মানুষের প্রয়োজনেই এর পরিবর্তন হয়েছে। সময়ের প্রয়োজনেই মানুষ এই পরিবর্তন বা আধুনিকায়ন মেনে নিয়েছে। বাঙলা ভাষার ইতিহাসের দিকে তাকালেই একথার প্রমাণ মেলে। এখানে দুঃসাহস বা ভয় ভিত্তির কোন ব্যাপার নেই। ভাষা আধুনিকায়নের গতির প্রতি স্রদ্ধাসিল হয়ে বা বাস্তবতাকে মেনে নিতে হলে বৈপ্লবিক পদক্ষেপ নিতে হবে। প্রয়োজনে ব্যাকরণ সঙ্কস্কার করলেইবা ক্ষতি কি? ব্যাকরণতো কোন ঐশি গ্রন্থ নয় যে তাতে হাত দিলে হাবিয়া দোজখে নিষ্কিণ্ড হতে হবে। ব্যাকরণতো ভাষার জন্য। আর ভাষাতো মানুষের জন্য।

তাই এখন বোধ হয় সময় এসেছে বাঙলা ভাষা আধুনিকায়নের। এটা সুধুই আধুনিকায়ন। পরিবর্তন বা সঙ্কসোধন নয়। আর এই কাজটি করতে গিয়ে ঙ্গ, উ, ণ, শ, ং এই পাঁচটি অক্ষর বাদ দিয়ে বাঙলা ভাষা চর্চা করাই ভাল। এই পাঁচটি অক্ষরের জন্যেই সাধারণ মানুষকে সবচেয়ে বেশি বিভ্রান্ত হতে হয়। আর বৈপ্লবিক এই কাজটি বোধ হয় কোন সেমিনার, মিটিঙ বা সাকুলার জারি করে সম্ভব হবেনা। এটা করতে হলে ওই পাঁচটি অক্ষর বাদ দিয়ে ভাষা চর্চার অভ্যাস করতে হবে। আতকে ওঠার কিছু নেই। সময়ই সুধু বলে দেবে এর সফলতা। এবঙ আনন্দের কথা, ইতোমধ্যে আমরা তেমন প্রচেষ্টার আলামত দেখতে পাচ্ছি। বাক-স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ বা ধমক দিয়ে কিছু বন্ধ করতে যাওয়ার অর্থই হচ্ছে কোন দুর্বলতাকে ধামা চাপা দেবার অপচেষ্টা। মুখ বন্ধ করে দেবার প্রবনতা গোড়ামিকেই ধারণ করে। এগিয়ে যাবার পথ বন্ধ করে দেয়। প্রস্ন উঠেছে বাঙলা বানানে হাত দেবার অধিকার কারো আছে কিনা? আগেই বলেছি, আমি কোন ভাষাবিদ বা পণ্ডিত নই। একজন

সাধারণ মানুষ। জন্মের পর একটি সাধারণ সিসু যে অধিকারে মা সন্দটি উচ্চারণ করে, একজন সাধারণ স্রমজিবি মানুষ যে অধিকারে মাতৃভাষার জন্য বুকের রক্ত ঢেলে রাজপথে লুটিয়ে পড়ে, আমিও সেই অধিকারে আমার প্রানের বাঙলা ভাষাকে সুন্দর ভাবে সাজিয়ে নিতে চাই। আমার এ মতের সাথে একমত হওয়া বা দ্বিমত পোষন করা যার যার ইচ্ছে।

ওই অক্ষরগুলো বাদ দিয়েই আমার সেই চিত্রনাট্য থেকে লিখে ফেললাম আমার প্রথম উপন্যাস *এখনো গর্ভে তোমার*। তারপর একই ভাবে আরো দু'টি উপন্যাস *তখন* এবং *কেন*। এবং আরও পরে ইলেক্ট্রনিক সঙ্করন কাব্যগ্রন্থ *আকাশ রঙ স্বপ্ন*। সবগুলোই এক এক করে বাজারে বের হল। ভবিষ্যতেও একইভাবে লেখালেখির কাজ চালিয়ে যেতে চাই। আমার লেখাগুলোই প্রমান করবে বানান নিয়ে আমার এই ভাবনা কতটা ধোপে টেকে।

২০.৪.২০০৩

কল্যানপুর, ঢাকা